প্রথম অধ্যায়

বাংলা নাটকের উদ্ভব ঃ সমকালীন ইতিহাস

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের যে সব শাখা নবজীবন লাভ করে, নাটক তাদের মধ্যে অন্যতম। নাটকের এই নব রূপায়ণের মূলে অবশ্য কাজ করেছে বাংলা গদ্যের ভূমিকা। সংলাপ বাস্তবানুগ ও জীবন্ত না হলে নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। তার জন্য চাই উন্নতমানের গদ্য রচনা। বাংলাদেশে আধুনিক কালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে যে গদ্যরচনার চর্চা শুরু হয়, তা ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে পৌঁছে সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে ওঠে। তিনি গদ্যের ভিতরকার ছন্দকে বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাঁর হাতে বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাঙালী নাট্যকারেরাও এই গদ্যরচনার আদর্শ সামনে রেখে নাট্যসংলাপের ভাষা রচনা করতে পেরেছিলেন। তার ফলে গদ্য, কাব্য এবং উপন্যাস সাহিত্যের মতো নতুন রীতির নাট্যচর্চা এদেশে শুরু হতে থাকে। গদ্যরচনা এবং সংলাপ রচনার কৃতিত্ব নাটকের সৃষ্টি সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া নাট্যসৃষ্টির মূলে কাজ করে দেশীয় মানুষের নাটক দেখার কৌতূহল।

বাংলাদেশে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য বহু পুরানো। এর পিছনে ভারতীয় নাটকের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ প্রমুখের সংস্কৃত নাটকের ধারনাটি বহু বিস্তৃত এবং দীর্ঘ। সেকালে নাটক যে রীতি মতো অভিনীত হতো তার প্রমাণ পাই কালিদাসের একটি নাট্য উক্তিতে। তিনি শকুন্তলা নাটকের সূচনায় বলেছেন, বিদ্বানদের পরিতোষেই নাটকের পরীক্ষা "আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্"। প্রাচীন ভারতবর্ষের আরও একটি উক্তি — "প্রয়োগ প্রধানম্ হি নাট্যশাস্ত্রম্" — এটি অভিনয়ের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র নাট্যাভিনয়ের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই সব উক্তির পাশাপাশি আরো বেশ কিছু প্রমাণ থেকে জানা যায় প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১] সেই সব সুসজ্জিত নাট্যশালায় সমাজের উচ্চশ্রেণীর রসিক মানুষরা অভিনয় দেখতে সমবেত হতেন। তবে তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। নীচের তলার মানুষদেরও নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবে নাট্যচর্চার পথ ছিল। তবে তার নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

এই ঐতিহ্য কেন ক্ষীণ হয়ে পড়ল তা বলা যায় না, হয়তো সামাজিক রাজনৈতিক কারণে নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকের অভাব ঘটে। নাট্যগুণান্বিত রচনারও অভাব দেখা দেয়। শক্তিধর নাট্যকারের অভাবও ছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নাটক শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায় না। তবে নাটক প্রসঙ্গের কিছু কিছু উল্লেখ ও কোনো কোনো রচনার মধ্যে নাট্যধর্মিতা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন চর্যাপদে বুদ্ধনাটক ও নটপেটিকার কথা আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য হলেও ভিতরে ভিতরে নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন এটি নাট্যগীতি শ্রেণীর রচনা। কবি জয়দেব যে নিজকে পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী বলেছেন এর মানে তিনি পদ্মাবতীর নৃত্যের তাল রক্ষা করতেন। এতে নৃত্যগীত ও অভিনয়ের গুণ মিশে ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে বলা হয় নাট্যগুণসম্পন্ন রচনা। এটিও যে অভিনেয় কাব্য বা নাট্যগুণান্বিত কাব্য তার প্রমাণ আছে এর উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপগুলিতে। এগুলির অভিনয় গুণ ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলি গান করা হত। কিন্তু গায়কেরা গানের মাঝে মাঝে কখন কৌশলে তাকে নাট্যগুণান্বিত করে তুলেছেন। এ সবের পাশাপাশি বাংলাদেশের লোকসমাজে নানা রীতির আঞ্চলিক লোকনাট্যেরও প্রচলন ছিল। স্পষ্টত অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ে। তিনি পারিষদবর্গের সঙ্গে 'রুক্মিণীহরণ' নামে একটি নাটক অভিনয় করেছিলেন।[২] চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে কৃষ্ণলীলার প্রচার হয় তার কথা মনে রেখে রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিতমাধব' নামে দু'খানি নাটক প্রণয়ন করেছিলেন। রামানন্দ রায় 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক এবং কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কৃষ্ণলীলা এবং চৈতন্যলীলা নাট্যরচনার বা নাট্যধর্মী রচনার বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার সপ্তদশ শতাব্দীর পরের দিকে রচিত বাংলা নাটকের কিছু নমুনা নেপাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি বাংলা নাট্যচর্চার প্রমাণ। কৃষ্ণলীলার পাশাপাশি 'বিদ্যাসুন্দর' 'নলোপাখ্যান' প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। এখানে বলা দরকার আধুনিক রীতির নাটক একেবারে উনিশ শতকের সৃষ্টি। মধ্যযুগে বাংলাদেশে যে নাট্যাভিনয় হত তা ছিল পুরানো রীতির যাত্রা। এগুলি ছিল সঙ্গীত প্রধান। চরিত্রগুলি গানে গানে অভিনয়ের কাজ সম্পন্ন করত। মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত অধিকারী কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেন।[৩] এই ধরনের যাত্রা - কৃষ্ণযাত্রা উনিশ শতকে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামী কতকগুলি পালা রচনা করে একে নতুনভাবে প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[৪] কিন্তু এসব নাট্যরচনা মানুষের

রসতৃপ্তি সাধন করতে পারছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশে কবিগান নামে এক ধরনের প্রমোদের জিনিস লোক সমাজে উদ্ভূত হয়। এর সঙ্গে আখড়াই, হাফ আখড়াই ইত্যাদিও ছিল। কবিগান বা পুরানো যাত্রা কিংবা অন্যান্য শ্রেণীর গীত মানুষের আমোদ প্রমোদের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হলেও মানুষের রুচি ভিতরে ভিতরে বদলে যাচ্ছিল।

উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির অনেক বদল হয়েছিল। তখন কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে নব্য নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছে। তাদের আমোদ প্রমোদের উপকরণ হিসেবে এই সব অভিনয় বা নাট্যরীতি প্রচলিত আছে বটে কিন্তু নতুন রীতির নাট্যচর্চার জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতায় ইংরেজরা রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে সেখানে নাটকের অভিনয় করছেন। শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিরা সেখানে অভিনয় দেখতে যাচ্ছেন। কলকাতার মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের মনেও নাট্যরস পিপাসা জাগ্রত হচ্ছে। ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লেখা হচ্ছে ঃ "বিদ্যাসুন্দর নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পাদন হইয়া থাকে। তাহাতে আমোদ প্রমত্ত ইতরলোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না।"[৫] স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। তাঁদের এখন পুরানো যাত্রা পাঁচালি বা কবিগানে রসতৃপ্তি হচ্ছে না। নতুন ধরনের নাটকের দিকে জনসাধারণের আগ্রহ জাগছে। আর নাটক হচ্ছে এমন একটি যৌথ শিল্প যার জন্য চাই নট, নাটক ও নাট্যমোদী দর্শক — এ তিনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান। এই সব কারণে নাটকের নূতন রীতির সূত্রপাত হল ইংরেজী নাটকের অনুসরণে। সুকুমার সেন বলেছেন "বিলাতি স্টেজ- অভিনয় দেখিয়াই আমাদের দেশের লেখকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। নাটক বলিতে এখন যাহা বুঝি তাহা আমাদের দেশের ইংরেজ আমলের আগে ছিল না।"[৬]

পলাশী যুদ্ধের কয়েক বৎসর আগেই কলকাতায় প্রথম ইংরেজ প্লে হাউস ও নাচঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে এই নাট্যশালাটি ধ্বংস হয়।[৭] তখন ইংরেজরা নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারই ফলে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা নিউ প্লে হাউসের প্রতিষ্ঠা হয়।[৮] ইংল্যান্ডের রঙ্গমঞ্চে তখন পূর্ণশক্তিতে বিরাজ করেছিলেন গ্যারিক। ইংল্যান্ডের থিয়েটারের অনুকরণে 'ক্যালকাটা থিয়েটার'কে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে সেদিন কর্তৃপক্ষ গ্যারিকের সাহায্য চেয়ে ছিলেন।[৯] গ্যারিকের নির্দেশ মতো মঞ্চের দৃশ্যপট আঁকা হয়েছিল এবং অন্যান্য সাজসজ্জা

ব্যবহার করা হয়েছিল। এখানে শেক্সপীয়রের নাটক 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'রিচার্ড দি থার্ড', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অভিনীত হয়েছিল। অন্যান্য খ্যাতনামা নাট্যকারের নাটকের অভিনয়ও হত। ১৭৮৯ সালে এই নাট্যশালায় কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ "The Indian Drama of Sakuntala of Fatal Ring" অভিনীত হয়েছিল। সে যুগের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিস্টো এই মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করতেন। ১৭৮৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী হেষ্টিংসের কাউন্সিলের খ্যাতনামা এডওয়ার্ড হোয়েলারের নামে হোয়েলার প্লেস থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়। খুব জাঁকজমক সহকারে এই থিয়েটার শুরু হয়। ১৮১২ সালে সার্কুলার রোডে দ্বারোদঘাটন হল এথেনীয় থিয়েটারের। এই থিয়েটারের প্রথম রাতে 'আর্ল অব এসেক্স' নামে বিয়োগান্তক নাটক এবং 'রেজিং দি উইন্ড' নামে একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। এই থিয়েটারে ১৮১৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি 'হ্যামলেট' ও সেই সঙ্গে 'লাইং ভ্যালেট' নামে একখানি প্রহসন মঞ্চস্থ হয়।[১০] ১৮২৬ সালের ২৭শে জুলাই এই রঙ্গালয়ে সেরিভানের বিখ্যাত নাটক 'School for Scandal' মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাতে মিসেস লীচ্ অভিনয় করেছিলেন। ১৮২৬ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত এই রঙ্গালয়ের সবকটি নাটকেই তিনি অভিনয় করেছিলেন। ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চৌরঙ্গী থিয়েটার। সেকালের বহু প্রথিতযশা ব্যক্তি এবং দু'জন বিখ্যাত পণ্ডিত এই রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা হলেন সংস্কৃত অধ্যাপক হোরেস্ হেম্যান উইলসন এবং হিন্দুকলেজের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ডি এল রিচার্ডসন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "রিচার্ডসন শেক্সপীয়র যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই"। মেকলে তাঁর অবিস্মরণীয় শেক্সপীয়র আবৃত্তির প্রশংসা করেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় সেকালের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে এই রঙ্গালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরও এই রঙ্গালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শিল্পী ও কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেখানে উচাঙ্গের অভিনয় হত। এতে অসংখ্যক দর্শকবৃন্দের সমাগম হত। সমসাময়িক সংবাদ পত্র পত্রিকাগুলিতে এই রঙ্গালয়ের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়। চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রথিতযশা অভিনেত্রী মিসেস লীচ্, অন্যান্য কয়েক জন পৃষ্ঠপোষক এবং বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৪১ সালের ৮ই মার্চ "সাঁ সুচি" নামে একটি নতুন রঙ্গমঞ্চ লালদীঘির কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রঙ্গমঞ্চে 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ইত্যাদি নাটক খুবই নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। মহারাজা রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ রায়, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ সেকালের কলিকাতার অভিজাত বাঙালীর উদ্যোগে 'ওথেলো' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করা

হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে সেন্ট জেম্‌স থিয়েটার, মিসেস নিউইস্‌ এর রয়্যাল থিয়েটার, অপেরা হাউসে মিসেস্‌ ইংলিশের রঙ্গালয়, ফোর্ট উইলিয়ামে থিয়েটার রয়্যাল এবং গ্যারিসন থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যশালা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা হলেও এ রঙ্গমঞ্চগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমনকি কলকাতার বাইরে ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে ইংরেজরা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১১]

ইংরেজদের অনুকরণে ইংরেজি রীতির নাট্যালয় স্থাপন করে বাংলা নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে যিনি প্রথম এগিয়ে এলেন তিনি একজন রুশ পর্যটক হেরাসিম লেবেডেফ। (Gerasim S. Lebedeff)। তিনি ১৭৪৯ থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হেরাসিম ১৭৮৫ সনে ভারতে এসে পৌঁছান। প্রথম দু'বছর মাদ্রাজে অতিবাহিত করে ১৭৮৭ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন।[১২] বঙ্গদেশের নাট্যচর্চার সাংস্কৃতিক দীক্ষা তাঁর ছিল। তিনি নিজে বেহালাবাদক রূপেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশে এসে কেন যে তিনি নাট্যমঞ্চ ও অভিনয় শিল্পে মনোযোগী হয়ে উঠলেন তা বলা দুষ্কর। তিনি কলকাতায় বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। তারপর তিনি M. Joddrel রচিত 'The Disguise' নাটকের অনুবাদ করেন। তিনি লিখেছেন — "আমি ইংরেজী হইতে বাংলা ভাষায় দুইটি নাট্যরচনা অনুবাদ করিলাম। যথা 'ছদ্মবেশ' ও 'প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।'[১৩] এই অনুবাদ সমাপ্ত করে তিনি কয়েক জন পণ্ডিতকে ডেকে শোনান। এরপর তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসের প্রস্তাব অনুসারে তিনি নাটক অভিনয় করানোর জন্য প্রস্তুত হন। এভাবে স্টেজ তৈরী করে এবং পাত্র পাত্রীদের অভিনয় শিক্ষা দিয়ে তিনি নাটক অভিনয় করালেন। ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫ এবং ২১শে মার্চ ১৭৯৬ তারিখে অভিনয় হয়। দুদিনই অভিনয় দেখার জন্য দর্শকেরা ভিড় করেছিল। লেবেডেফ বাঙালী রুচির অনুযায়ী মঞ্চসজ্জা করেছিলেন। বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছিলেন তাঁর মঞ্চ ছিল "Decorated in the Bengalee Style"[১৪] কিন্তু সে যাই হোক কোন কারণে লেবেডেফ নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন এর পিছনে তৎকালীন ইংরেজ বণিক ও রাজপুরুষের চক্রান্ত ছিল।[১৫] তার ফলে তিনি বহুমূল্য মঞ্চোপকরণ প্রভৃতি অতি অল্প দামে বিক্রী করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন "কোম্পানীর হীন ষড়যন্ত্রের জন্য বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিরাট সম্ভাবনা সেদিন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল।"[১৬] হেরাসিম লেবেডেফের নাটক ভালো কিন্তু অনুবাদ নয়। তাঁর গদ্য সংলাপ আড়ষ্ট, বিষয়বস্তুও যথেষ্ট দানা বাঁধেনি। কিন্তু ইংরেজি মঞ্চ ব্যবহার করে বাংলায় নাটক অভিনয় করবার কাজ তিনিই করেছিলেন। বাংলায় রঙ্গমঞ্চের পটোত্তোলনের কাজ সেদিন এই রুশ নাট্যপ্রেমিক মানুষটির হাতেই হয়েছিল।

এটি যেমন উল্লেখযোগ্য তথ্য তেমনি এও স্মরণযোগ্য যে এই নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা বাংলা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী উত্তরাধিকার সৃষ্টি করতে পারেনি। তা একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হিসেবে শুরু হয়ে জন্মলগ্নেই শেষ হয়ে গেছে। কেবল ইতিহাসে তার একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে মাত্র। ''ইহারা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কলিকাতার বিচিত্র জীবনে ইহা একটি বিচ্ছিন্ন প্রয়োগরূপে অন্তরালবর্তী হইয়া রহিয়াছে''।[১৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলাদেশে বাঙালীর জন্য কোন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু যে সময় নাগরিক শ্রেণীর মধ্যে নাট্যরস তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেদিন এই অভাববোধে পত্রিকায় লেখা হয়েছিল।

> এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মতো তাহাদের আমোদ প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই'[১৮]

তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত ধনী ও শিক্ষিত বাঙালী দুটি তিনটি উপায়ে নাট্যরস পিপাসা মেটাবার কাজ করেছিল। প্রথমত, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, মতিলাল শীল, রামনাথ ঠাকুর প্রমুখের মতো অভিজাত বংশীয়েরা কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এভাবে অনেক বাঙালী প্রেস থিয়েটার (১৭৯৯), চন্দননগর থিয়েটার (১৮০৮), এথেনিয়াম থিয়েটার (১৮১৭), বৈঠকখানা থিয়েটার (১৮২৪) এবং সাঁসুচি থিয়েটার (১৮৩৯ - ৪৯) এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১৯] কেবলমাত্র এদের আত্মীয়বর্গ এবং বন্ধুবান্ধবেরা এই রঙ্গমঞ্চগুলিতে নাটক দেখবার সুযোগ পেতেন। দ্বিতীয়ত,এই সব থিয়েটারে অভিনয় দেখে দেশীয় অভিজাত লোকেরা কেউ কেউ ইংরেজ অভিনেতাদের সঙ্গে বিদেশী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে শুরু করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাঁসুচি থিয়েটারের বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক সমালোচকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন। সমালোচকেরা দেশীয় লোকদের ''অভিনয়ে অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন''।[২০] ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পাঠক্রমে ইংরেজী নাটক বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটক পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজ অধ্যাপকদের শিক্ষাগুণে এবং নাটকের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশত তরুণ ছাত্ররা কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শেক্সপীয়রের নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করতেন।[২১] ওরিয়েন্টাল সেমিনারের শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 'ওথেলো' (১৮৫৩), 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' (১৮৫৪) এবং

'হেনরি দ্য ফোর্থ' (১৮৫৫) নাটকের অভিনয় হয়। এই সব ইংরেজি থিয়েটারে এবং স্কুল কলেজের অস্থায়ী মঞ্চে অভিনয় দেখে নব্যশিক্ষিত নাট্যমোদী সম্প্রদায়ের মনে নাটক দেখা ও অভিনয় করার ইচ্ছা জাগে। এই ভাবে বাঙালীর মনে নাট্যরস তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। এই চেতনা ধারার পরবর্তী স্তরে বাঙালীর নিজের থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দেখা যায়। বিদেশী আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় আসেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাঙালীর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাগান বাড়িতে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের একাংশ এবং উইলসন অনূদিত ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে'র অভিনয় দিয়ে[২২] এই নাট্যশালার দ্বারোদঘাটন হয়। বহু শিক্ষিত বাঙালী ও ইংরেজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এরপর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঞ্চে 'বিদ্যাসুন্দর' নাট্যাভিনয় হয়। এই অভিনয়ের চমকপ্রদ অভিনবত্ব ছিল এই যে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য বাড়ির বিভিন্ন অংশে অভিনীত হয়েছিল। দর্শকেরা অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে অভিনয় দেখেছিলেন। আর একটি দিক হল এই যে এখানে স্ত্রী-ভূমিকায় স্ত্রীলোকেরা অভিনয় করেছিলেন। হিন্দু পাইওনীয়ারের মন্তব্য ছিল এ হেন অভিনয়ে সমাজ সংস্কার এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হবে।[২৩] কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় যে নীতি বিগর্হিত এরকম সমালোচনাও হয়েছিল। এসব প্রচেষ্টা স্থায়ী হয়নি। বাংলা নাটকের অভাবে এসব মঞ্চে অভিনয় হয়েছে প্রধানত ইংরেজী বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। কিন্তু এসব প্রচেষ্টার ভূমিকা একেবারেই বিফলে যায়নি। এসব সচেতন নাট্যপ্রয়াসের ধারা থেকেই ক্রমে বাংলা নাটকের সূত্রপাত হয়েছে। যে নাটক লেখা শুরু হল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, তার গতি আর রুদ্ধ হয়নি। সেই কথা বলার আগে পরের দিকের রঙ্গমঞ্চের অবস্থার কথা একটু এখানে উল্লেখ করে নিতে চাই। প্রসন্নকুমার ঠাকুর বা নবীন বসুর বাড়ির থিয়েটার স্থায়ী কোন ভূমিকা রেখে যেতে পারেনি। তারা ইতিহাসের একটা একটা চিহ্ন হিসেবে থেকে গেছে। এরপর বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। ইতিমধ্যে বাংলায় মৌলিক ও অনুবাদ নাটকের রচনা শুরু হয়েছে। নাটক রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে তার উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাটক রচনা অভিনয় ও দর্শকের একটা চিত্তযোগ দেখা দিয়েছে। থিয়েটারকে এখন সমাজ সংস্কারের উপকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা শুরু হয়েছে। ফলে রুচির উন্নতি যেমন হচ্ছে তেমনি তাকে শিক্ষা ও আনন্দ দুদিক থেকে দেখা হচ্ছে।[২৪] বাংলা

মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ সালটি গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরে কয়েকটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং নাটক অভিনয় হয়েছে। প্রথম অভিনয় হয় আশুতোষ দেবের বাড়ির মঞ্চে। ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি এখানে নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়। এটিকে বলা যায় বাঙালীদের দ্বারা বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয়। লেবেডেফের প্রচেষ্টা বা নবীন বসুর বাড়ির অভিনয়কে এর বাইরে রাখা হয়েছে। এর অল্পদিন পরে ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হল। রামনারায়ণ তর্করত্ন পাদপাদ্রীদের আলোকে এসে উপস্থিত হলেন। তার চেয়েও বড় কথা যে নাটক তিনি নিয়ে এলেন নানা কারণে বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে তা গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হল। কালীপ্রসন্ন অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অভিনয় হল এর কিছুদিন পরে। কালীপ্রসন্ন এই নাটক দুটিতেই অভিনয় করেছিলেন। বলা বাহুল্য এসব সংস্কৃত নাটকের অভিনয় বিদেশী অভিনয়ের ধারা অনুসরণ করেই হত। ইংরেজ দর্শকেরা এসব নাটক দেখতে আসতেন। এই রঙ্গমঞ্চটিকে বাঁচিয়ে রাখার অক্লান্ত চেষ্টা ছিল কালীপ্রসন্নের। ১৮৫৮ সালে এই মঞ্চে তাঁর 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের অভিনয় হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট কালীপ্রসন্নের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে সাধুবাদ জ্ঞাপন করে বলে,এরূপ একটি নাট্যশালা চিরস্থায়ী হওয়া উচিত।[২৫] এর অল্প কিছুদিন পরে পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া বাগান বাড়িতে একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে রামনারায়ণের অনূদিত শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই মঞ্চের দ্বারোদঘাটন হয়। এই নাটকের অভিনয়ে রাজাদের নাকি দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল, নাট্য অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সেযুগের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী। এই 'রত্নাবলী' অভিনয় দেখতে বহু গণ্যমান্য অতিথি এসেছিলেন। যাঁরা অভিনয় দেখতে ছিলেন তাঁরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে এই মঞ্চ এবং অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুন্যের প্রশংসা করেছিলেন। মধুসূদন দত্ত এই নাটক অভিনয়কে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করলেন। এজন্য সুকুমান সেন রত্নাবলী নাটকের অভিনয়কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেছেন।[২৬] শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন ''এই নাট্যালয় বঙ্গ সাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায় স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল''।[২৭] ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর এখানে মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রাণ স্পন্দন সঞ্চার করল।

পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর ভাই সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ১৮৬০ এর জুলাই মাসে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' অভিনয় হল। ১৮৫৯ খ্রীষ্ট্রাব্দে মেট্রোপলিটন থিয়েটার গড়ে উঠল। শোভাবাজার রাজাদের শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির পত্তন হল (১৮৬৫)। আর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। পাথুরিযাঘাটা রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চ এবং জোড়াসাঁকো মঞ্চে রামনারায়ণ ছিলেন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। প্রথম দুটি মঞ্চে তাঁর অনেকগুলি অনুবাদ নাটক অভিনীত হয়েছে। জোড়াসাঁকো মঞ্চে অভিনয়ের জন্য তিনি 'নব-নাটক' লিখেছিলেন। এই নাট্যশালাগুলি বাংলা নাট্যরচনার পক্ষে যেমন উৎসাহ ব্যঞ্জক কাজ করেছে তেমনি আবার নিজেদের ইচ্ছানুসারে অভিনয়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে। শোভাবাজার মঞ্চে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হয়েছে। জোড়াসাঁকো মঞ্চে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হয়েছিল।

এই মঞ্চগুলি বাংলা নাটকের অভিনয় এবং বাংলায় নাটক রচনাকে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু গবেষকেরা লক্ষ করে দেখেছেন এসব ধনী রাজা জমিদারদের নাটক নির্বাচন ও নাট্যাভিনয়ের পিছনে তাঁদের বিশেষ মতাদর্শ কাজ করেছে । এইজন্য দেখা যায় সমাজ সমস্যামূলক বা যা প্রত্যক্ষভাবে সমাজ পরিবর্তনকামী এই রকম নাটককে তারা অভিনয় করবার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। অন্যপক্ষে সংস্কৃত নাটকের আড়ম্বরপূর্ণ মঞ্চায়নে তাঁরা ছিলেন মুক্তহস্ত। এর প্রভাব নাটক রচনার উপরও পড়েছিল। মধুসূদন দত্ত অভিমান করে বাংলা ভাষায় নাট্যরচনা করবেন না বলে জানিয়েছিলেন।[২৮]

১৮৫৭ সাল থেকে যে নাট্যমঞ্চগুলি গড়ে ওঠে সেগুলিকে ধনী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার পরিচালিত মঞ্চ বলা যায়। এই মঞ্চগুলিতে যে নাট্যাভিনয় হত সেখানে সাধারণ দর্শকের প্রবেশাধিকার ছিল না । সেজন্য তা সর্বসাধারণের রসপিপাসা চরিতার্থ করতে পারেনি। এই লক্ষ্য মাথায় রেখে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা করা হয়। ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত মঞ্চগুলি প্রায় উঠে গেছে বা অভিনয় কমে এসেছে । জনসাধারণের দিক থেকেও টিকিট বিক্রী করে অভিনয় করার প্রস্তাব উঠেছে।[২৯] এই সময় পাথুরিয়াঘাটা মঞ্চে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অভিনীত হচ্ছে। আবার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাগবাজার 'এমেচার থিয়েটার' তৈরী করেছেন। সেখানে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনয় হচ্ছে। এই 'বাগবাজার এমেচার' থিয়েটার এর কোনো স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। তাঁরা যুগের দিকে লক্ষ রেখে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করলেন। 'নীলদর্পণ'

অভিনয় করে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র দ্বারোদঘাটন হল।

'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার ফলে সখের থিয়েটার যুগের অবসান হল। রঙ্গালয় অর্থকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' 'নীলদর্পণ' অভিনয় করে মঞ্চচর্চার যে নূতন যুগের সূচনা করল তার তাৎপর্য আছে। রাজা মহারাজার বৈভবপূর্ণ আড়ম্বর থেকে সংস্কৃত অনুবাদ নাটক থেকে বাঙালীর নাট্যচর্চা মুক্তি পেল। তা জনজীবনের সমস্যাকে তুলে ধরল। এইখানে নাট্যমঞ্চের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠল। দ্বিতীয়ত, ভালো নাটক, সামাজিক নাটক রচনার দিকেও তারা নাট্যকারদের উৎসাহিত করে তুলল। সাপ্তাহিক অভিনয়ের জন্য নাটকের চাহিদাও বেড়ে গেল। এর ফলে নাট্যকারদের মনে নাট্যরচনার আগ্রহ বেড়ে গেল। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' 'সধবার একাদশীষ ও 'নবীন তপস্বিনী' অভিনীত হয়েছে। দীনবন্ধুর নাটকগুলি বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনয় কর্মে সাহায্যকারী হয়েছিল বলে এরা তাঁকে রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন ।

' ন্যাশনাল থিয়েটার' গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। একটি দল ন্যাশনাল থিয়েটার নাম রেখে প্রথমে টাউন হলে পরে রাধাকান্ত দেবের নাট্যমন্দিরে অভিনয় প্রদর্শন করে। অন্য দলটি 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে কালীপ্রসন্নের অপেরা হাউসে অভিনয় শুরু করে। হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার পরে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু ও মধুসূদনের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই দুই দল নাটককে মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলেও ছড়িয়ে দিয়েছিল। এরা সম্মিলিত ভাবে মধুসূদন দত্তের সন্তানদের সাহায্যকল্পে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় করেছিল।

'ন্যাশনাল থিয়েটার' এর অনুসরণে শ্যামবাজারে কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়িতে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার তৈরী হয়। এখানে রামনারায়ণের 'মালতীমাধব' ও 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এর অল্প কিছুকাল পরে বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হয়। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় করে এই নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন হয়। এখানে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী', 'চক্ষুদান' ও 'রুক্মিণীহরণ' নাটকের অভিনয় হয়েছিল।

মঞ্চের টানে আমরা বহুদুর চলে এসেছি। এখন একটু পিছন দিকে ফিরে বাংলা নাটকের ইতিহাসকে দেখতে হবে। আগেই দেখেছি ১৭৯৫ সালে লেবেডেফ যে বাংলা নাটকের অভিনয়

করিয়েছিলেন। সেগুলি ছিল ইংরেজি নাটকের অনুবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ জুড়েও ছিল এই অনুবাদ নাটকের প্রাধান্য। ১৮২২ থেকে বাংলা নাটকের পর্ব সূচনা। ১৮৫০ পর্যন্ত যেগুলি নাটক নাম নিয়ে রচিত হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিই অনুবাদ, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২২) প্রথম বাংলা অনুবাদ নাটক। এটি শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের অনুবাদ। জগদীশের ' হাস্যার্ণব' প্রহসনের অনুবাদ হয়েছিল একই বছরে। ১৮২৯ সালে 'কৌতুকসর্বস্ব' নাটকের অনুবাদ করেন হরিনাভি নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অনুবাদ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র রামতারক ভট্টাচার্য ১৮৪৮ সালে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন বলে ঈশ্বরগুপ্তের একটি উক্তি থেকে জানা যায়। সুকুমার সেন বলেছেন তা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ।[৩০] এরপর পাই নীলমণি পাল অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটক। 'রত্নাবলী' সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হতো। সেই কারণে এটি অনুবাদের ঝোঁক ছিল। তবে এর অভিনয় তখনও হয় নি । ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে সব নাটক অনুবাদ হয়েছে সেগুলি ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও অভিনয়ের পক্ষে নিতান্তই মূল্যহীন রচনা । সংস্কৃত নাটকের আড়ষ্ট ও দুর্বল অনুবাদগুলির কোন অভিনয় হয়নি, তার দ্বারা মানুষের নাট্যরস তৃষ্ণা মেটানো সম্ভব ছিল না। ফলে এইগুলি কোন ইতিহাসের কৌতুহল নিবৃত্তির কাজে লেগেছে। বাংলা নাটকের পরবর্তী ধারার পক্ষে এই ইতিহাসেরও কোন গুরুত্ব নাই।

বাংলা নাটকের যথার্থ সূচনা হল বলা যায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। জি.সি. গুপ্ত এবং তারাচরণ শিকদার এই বছর তাঁদের 'কীর্তিবিলাস' ও ' ভদ্রার্জুন' রচনা করলেন। 'কীর্তিবিলাস' রূপকথার কাহিনীর আদলে আর 'ভদ্রার্জুন' মহাভারতের 'সুভদ্রাহরণের' কাহিনী নিয়ে লেখা। এই দুটি নাটক থেকে বাংলার মৌলিক নাটকের সূচনা বলে সাহিত্যের ইতিহাসে এদের গুরুত্ব আছে। তাছাড়া এই নাট্যকারেরা ছিলেন নাট্যসচেতন লেখক। নাটকের দেশবিদেশের প্রকরণ এঁদের জানা ছিল। 'ভদ্রার্জুন' নাটকের ভূমিকায় তারাচরণ উল্লেখ করেছেন —

> বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এদেশের নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলা অনুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে

মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।" বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ।[৩১]

তাই নাট্যকার মহাভারতের কাহিনী নিয়ে ইউরোপীয় নাটকের রীতি মেনে এই নাটকটি রচনা করেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী মঞ্চে 'ভদ্রার্জুন' অভিনীত হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে অভিনীত হয়নি। এমনকি বইটি পাঠ্যগ্রন্থ রূপেও গৃহীত হয়নি। 'ভদ্রার্জুনে'র কাহিনী নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি নয়। কিন্তু যে কাহিনী তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার যথেষ্ট নাট্যগুণ ছিল।[৩২] সুতরাং কাহিনী নির্বাচনে তারাচরণের নাট্যপ্রতিভার প্রমাণ মেলে। যে ভাবে তিনি কাহিনীটি উপস্থাপিত করেছেন তা যথেষ্ট নাটকীয়। নান্দী, সূত্রধার, নটীর দ্বারা নাটকের প্রস্তাবনা তিনি করেননি। তাছাড়া অঙ্ক এবং দৃশ্য (তারাচরণ বলেছেন সংযোগস্থল) ব্যবহারও তাঁর নাট্য সচেতন মনের পরিচয় দেয়। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় তারাচরণ বাংলা নাটককে পাশ্চাত্য নাটকের আদলেই গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। নাটকের ভূমিকার অংশে তিনি বলেছিলেন সূত্রধার, নটী, প্রস্তাবনা ইত্যাদি দিলে ইউরোপীয় নাটকের সঙ্গে এদেশীয় নাটকের কোন পার্থক্য থাকে না। এতে বোঝা যায় তিনি ইউরোপীয় নাটকের প্রাণধর্ম বাদ দিয়ে কেবল দেহধর্মের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। সে যাহোক কাহিনীর বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই নাট্যকার ' ভদ্রার্জুনে' দৃশ্যের পর দৃশ্য যোজনা করে তাকে এমন একটি গতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে কোন বাংলা নাটকে পাওয়া যায়নি। নাটককে গতিময় করার জন্য চাই ক্রিয়া। এই নাটকের সেই ক্রিয়া উপস্থাপনের বেশ কিছু সুযোগ ছিল। যেমন তস্কর যখন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে তখন অস্ত্রাগারে অর্জুনের প্রবেশ সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির আলাপ করছেন। এর ফলে একদিকে নাট্যক্রিয়া অন্যদিকে তস্কর প্রতিরোধ করতে না পারার জন্য যে উদ্বেল পরিস্থিতি তা যথেষ্ট নাটকীয় বৈপরীত্য রচনা করেছে। নাট্যকার প্রকৃত পক্ষে এই দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য সৃষ্টি করে এর নাট্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। দুর্যোধন সুভদ্রাকে যখন বিবাহ করতে আসছেন তখন অর্জুন তাকে অপহরণ করবার কথা ভাবছেন। সুভদ্রা দুর্যোধনের পরিণীতা হবেন এই জন্য যখন স্নান করতে যাচ্ছেন পথে তখনই তাঁকে অর্জুন হরণ করছেন। এ সবের পরেও চরম নাট্যদ্বন্দ্বের সুযোগ ছিল অর্জুনের সঙ্গে যদুসৈন্যের যুদ্ধের দৃশ্যে যদি নাট্যকার তা উপস্থাপিত করতে পারতেন। আসলে সে সম্ভাবনাকে নাট্যকার ব্যবহার করতে পারেননি। মহাভারতের সুভদ্রাহরণ কাহিনীর নাট্যগুণ মধুসূদনের মনকেও আকৃষ্ট করেছিল। 'সুভদ্রা' নামে একটি নাটক লেখার ইচ্ছে তাঁর ছিল।[৩৩] যদুগোপাল বসু এবং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ' সুভদ্রাহরণ'

নাটক লিখেছিলেন। তারাচরণ সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সম্মুখে কোন স্থির আদর্শ না থাকায় তা পারেননি। বিশেষ করে গদ্য সংলাপের উপর তিনি নির্ভর করেননি। সংস্কৃত নাটকের গদ্য পদ্য দুই-ই ব্যবহার করেছিলেন। তাতে নাটকের গতি ব্যাহত হয়ে পড়েছে। কাহিনী সাজাতে গিয়েও কখনো কখনো কোন পরোক্ষ ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন বলে কাহিনীর গতি রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তারাচরণ "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে"[৩৪] রচনা করেছিলেন। সেই প্রণালী ছিল আসলে বাংলা নাটকের গতিপথ নির্দ্ধারণ। ভবিষ্যতে বাংলা নাটক যে ইউরোপীয় নাট্যকলার পথ অনুসরণ করে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবে একথা তারাচরণ যেন ধরতে পেরেছিলেন, সেইখানে তাঁর কৃতিত্ব।

'ভদ্রার্জুন' একদিক থেকে বাংলা নাটককে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। 'কীর্তিবিলাস' আর একদিক থেকে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির দিকে নিয়ে যায়, সেটি রস পরিণতির দিক। 'ভদ্রার্জুন' নাটক বহিরঙ্গের দিক থেকে পাশ্চাত্য রীতির অনুকারী। 'কীর্তিবিলাস' ভিতরের দিকে রস পরিণতির পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। জি সি গুপ্ত তাঁর নাটকের ভূমিকায় লিখেছিলেন।

> অনেকের এইরূপে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়...।

তাঁর এই ভূমিকায় শেক্সপীয়র এবং এ্যারিষ্টটল এর উল্লেখ, শোক করুণ পরিণতির নাটক রচনার জন্য এই প্রতিনিধিত্ব, এ সবই পাশ্চাত্য নাট্যের রস সিদ্ধান্তকে বাংলা নাটকে ব্যবহার করার ভূমিকা মাত্র। যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাটকের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটিই স্মরণযোগ্য। নতুবা তাঁর নাটকের রচনা কৌশলগত গুরুত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। তিনি সংস্কৃত নাটকের নান্দীপাঠ দিয়েই শুরু করেছেন। নাটকের সংলাপও গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে লিখেছেন। সে সব দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব সামান্যই। তিনি বাংলাদেশে প্রচলিত রূপকথার কাহিনীকে ব্যবহার করে কেবল বিষাদময় পরিণতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কী ভাবে বৃদ্ধ রাজার তরুণী স্ত্রী সপত্নী পুত্রের অনুরক্ত হয়ে প্রত্যাখ্যাত হবার ফলে তার প্রতিহিংসা বিষে সমস্ত সংসার ধ্বংস হয়ে যায় কাহিনীটিতে তারই চিত্র আছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র নাটকের কাহিনী গঠনে মন দিতে পারেননি। তিনি বুঝতে চেষ্টা করেননি বিষাদ কারুণ্য কোনো পরিণতি

155234
Library
23 SEP 2003

মাত্রের বিষয় নয়, তা গোটা নাটকের কাহিনী বিন্যাসের ভিতর থেকে উত্থিত হয়। সুতরাং করুণ রসের নাটক লিখতে গেলে গোটা নাটকের কাহিনীকেই প্রথম থেকে গড়ে তুলতে হয়। যাই হোক, 'কীর্তিবিলাস' বা 'ভদ্রার্জুন' বাংলা নাটকের আদিপর্বে কোন পাশ্চাত্য নাট্য-কৌশলকে বাইরের দিক থেকে হলেও ধরবার চেষ্টা করেছিল। সেইখানে তাদের সামান্যতম ক্ষীণতম মৌলিকতা। এই সব চেষ্টা পরবর্তীকালে নাটকে ফলপ্রসূ হয়েছে। জি. সি. গুপ্ত নাটকে যে সংলাপ লিখেছেন তা মোটের উপর পড়া যায়। তবে কাহিনীর যে সত্তাকে নাটকের প্রাণ বলে এ্যারিস্টটল মনে করতেন তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

১৮৫২ সালে আর একজন নাট্যকার একটি অনুবাদ নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যে দেখা দেন। তিনি হুগলী কলেজের কৃতী ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ। তাঁর নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কিন্তু ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। হরচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ। শেক্সপীয়র চর্চায় তাঁর অধিকার ছিল কিন্তু তিনি স্বাধীন অনুবাদ করবার কাজটিকে ঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে পারেননি। গদ্যে পদ্যে সংলাপ রচনা ছিল দুর্বল। নাটকটিতে সংস্কৃত রীতি অনুসরণের ছাপ ছিল। এটিকে আশুতোষ ভট্টাচার্য ''নাট্যগুণ বিবর্জিত'' রচনা বলে মন্তব্য করেছেন। হরচন্দ্র এরপর মহাভারতের কাহিনী নিয়ে 'কৌরব বিয়োগ' রচনা করেন। তিনি ভেবেছিলেন দেশীয় বিষয় নিয়ে লিখলে তা জনপ্রিয় হতে পারবে। 'কৌরব বিয়োগ' দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ দিয়ে শুরু এবং কুরু পান্ডবের মহাধ্বংস ও শোক দিয়ে শেষ। কিন্তু বিষয় নির্বাচন, কাহিনী বিন্যাস কোনো দিকেই তার নাট্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় নি। এটির সংলাপও অত্যন্ত আড়ষ্ট ও দুর্বল । হরচন্দ্র ঘোষ এরপর আবার অনুবাদের কাজ করেন। এবার তিনি 'রোমিও জুলিয়েট' অনুবাদ করলেন। নাম দিলেন 'চারুমুখ চিত্তহরা'। এখানে তিনি গদ্য সংলাপ অনেকটা সতর্কভাবে লিখেছেন। সংস্কৃত নাটকের নান্দী, সূত্রধার, নট নটী ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নাট্যরচনা উৎকর্ষগত লাভ করেনি। হরচন্দ্রের শেষ নাটক ব্রহ্মদেশীয় উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'রজতগিরিনন্দিনী।' এটি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

হরচন্দ্র কুড়ি বছর ধরে নাট্যরচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি চারটি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু এগুলি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের বাইরে বেরোতে পারেনি এখানেই তাঁর রচনার সীমাবদ্ধতা।

হরচন্দ্র প্রথম নাটক লেখার দুবছর পরে রামনারায়ণ তর্করত্নের আর্বিভাব হয়। তাঁর সমকালে নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা' নাটকের অনুবাদ মঞ্চাভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিল। তাছাড়া এই সময় উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবাবিবাহ' নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের ধারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায়, প্রধানত অনুবাদই এই পর্বের নাট্যরচনার মূলস্রোত। এই অনুবাদ হয়েছে ইংরেজী এবং সংস্কৃত দুই ধরনের নাটক থেকে। নব্যশিক্ষিত শ্রেণী বাংলা নাটকের মুখ ইংরেজি নাটকের দিকে ঘুরিয়েছেন। অন্যপক্ষে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও এই সময় অনেক হয়েছে। এই কারণে এই পর্বকে অনুবাদ প্রধান পর্ব বলা যায়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণের নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' রচিত হয়। এটিকে প্রথম সমাজ সমস্যামিশ্রিত নাটক বলা যায়। কিন্তু অনুবাদ নাট্যরচনা হচ্ছে। ১৮৫৫ সালে নন্দকুমার রায় যে শকুন্তলা নাটক প্রণয়ন করেন, তা দুবছর পরে অভিনয় সৌভাগ্য লাভ করে। রামনারায়ণ নাট্যকার হিসেবে সামাজিক বিষয় অবলম্বন করলেও তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও করেছেন। তাছাড়া আর একটি প্রবণতা এই পর্বে লক্ষ করা যায়। যদিও তারাচরণ শিকদার, জি. সি. গুপ্ত বা হরচন্দ্র ঘোষ নাট্য রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজ নাটকের দিকে মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন তা সত্ত্বেও বাংলা নাটকে সংস্কৃত অনুবাদের পাল্লা কিন্তু ভারিই ছিল।

রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিপূর্বে তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৭) ও 'বেণীসংহার' (১৮৫৭) অভিনীত হয়েছে।[৩৫] বাংলা নাট্যজগতে তিনি খ্যাতিমান নাট্যকার হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। যে শ্রেণীর মানুষরা নাট্যশালা স্থাপন ও অভিনয় করবার জন্য উৎসাহী হয়েছেন, রামনারায়ণের নাটকে তাঁরা নিজেদের প্রাণের উত্তাপ পাচ্ছেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রাজা মহারাজা বা ধনীদের প্রাসাদমঞ্চে যে ধরনের নাটকের চাহিদা তার সামাজিক বা কল্যাণমূল্য অপেক্ষা প্রমোদমূল্যই অধিক। এই প্রমোদমূল্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য রামনারায়ণ প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের দিকে মন দিয়েছেন। শুধু রামনারায়ণ নন, কালীপ্রসন্ন তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। নন্দকুমার রায়ের অনুবাদ ''শকুন্তলা'' নাটক বেশ অভিনয় সাফল্য পেয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ এই সব মঞ্চে রাজা মহারাজাদের যে বৈভব ব্যসনের প্রদর্শন করা হতো সামাজিক নাটকে তা সম্ভব ছিল না।[৩৬] 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বা 'বিধবাবিবাহ' নাটক কিন্তু এই সব মঞ্চে অভিনীত হয়নি। মঞ্চে নাট্যাভিনয় যে যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষার উপকরণ হতে পারে এ চিন্তা আরো পরবর্তীকালের।

রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' অভিনয় (১৮৫৮) ইংরেজ দর্শকদের বোঝার প্রয়োজনে মধুসূদনকে দিয়ে নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মধুসূদন তখন মাদ্রাজ থেকে ফিরে কোলকাতায় আছেন। তিনি এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে এই ধরনের নাটক অভিনয়ের

পিছনে আড়ম্বর দেখে দুঃখিত হয়েছেলেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় সে পরিচয় আছে। মধুসূদনবাবু গৌরদাসকে বলেছিলেন, ''দেখ, কি দুঃখের বিষয় যে একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।'' গৌরদাস শুনে বলেন ''ভাল নাটক বাংলা ভাষায় কোথায় ?'' এতেই মধুসূদন বাংলা নাটক রচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; ''ভাল নাটক! আচ্ছা আমি রচনা করিব''।[৩৭] মধুসূদন এই সংকল্প 'শর্মিষ্ঠা' লিখে সার্থক করলেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যে অভিনত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখলেন ''যে সকল বাংলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে 'শর্মিষ্ঠা'কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।''[৩৮] বস্তুত বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই প্রথম প্রতিভাবানের পদপাত হল। কিন্তু তাও কিছু কুণ্ঠিত। কারণ মধুসূদন একেবারে অভিনব কিছু করে ফেললেন না। পুরানের রীতির ভিতর থেকেই নূতনের দিকে যাত্রা করলেন। 'শর্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনের কাছে উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ পত্র পাঠালেন। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হল।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মধুসূদন সংস্কৃত রীতির প্রভাব খুব বেশী কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন যে 'রত্নাবলী' নাটক মনে রেখেই তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পরিকল্পনা করেছিলেন। 'রত্নাবলী'র মঞ্চাভিনয়ের সাফল্যের কথাও তাঁকে মনে রাখতে হয়েছিল। তাছাড়াও তাঁকে মঞ্চ অভিনেতা ও মঞ্চসজ্জার কথা মনে রাখতে হয়েছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন অভিনীত হবার জন্য মধুসূদন নাটক লিখেছিলেন।[৩৯] আর সেজন্যই রত্নাবলীর মঞ্চোপকরণের মধ্য দিয়েই তাঁকে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হয়েছিল।[৪০] তিনি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত এ নাটক রাজকীয় আড়ম্বর প্রদর্শনের উপযুক্ত পরিবেশও রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ হয়নি, বাংলা নাটকেরও নূতনত্ব আয়ত্ত হয় নি। এবার তিনি বাংলাদেশের সমাজ চিত্রের দুটি দিক দিয়ে রচনা করলেন ''একেই কি বলে সভ্যতা'' ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ''। এই দুটি প্রহসন রচনা করে বাংলাদেশের সমাজজীবনের দুটি দিককে তিনি কঠোরভাবে কশাঘাত করলেন। প্রহসন দুটি কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে তার অভিনয় হল না। প্রভাবশীল মহল থেকে এ জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক রচনা সম্পর্কে আপত্তি করায় ঈশ্বরচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র প্রহসন অভিনয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন।[৪১] প্রহসন দুটিতে বাংলাদেশের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে মধুসূদনের শিল্পীমনের জীবন ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রহসন দুটি অভিনীত না হওয়ার ফলে

মধুসূদন ভেঙ্গে পড়েছিলেন। "Mind you broke my wings" তাঁর চিঠি থেকে এই উক্তি পাওয়া যায়। রচনার পাঁচ বছর পরে ১৮৬৫ সালের ১৮ জুলাই 'একেই কি বলে সভ্যতা' শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি অভিনয় করে। ১৮৬৬ সালে আর পুলি নাট্য সমাজ 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রথম অভিনয় করে। এরপর তিনি গ্রীক পুরাণের কাহিনী নিয়ে 'পদ্মাবতী' রচনা করলেন। এই কাহিনীটি তিনি গ্রীক পুরাণের গল্প নিয়ে বঙ্গীয় রূপে গড়ে তুললেন। কিন্তু এই নাটকটি সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় সৌভাগ্য লাভ করেনি। রচিত হবার পাঁচ বছর পর ১৮৬৫ সালে পাথুরিয়াঘাটায় এর অভিনয় হয়েছিল।[৪২] এরপর মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করলেন। এটি প্রথম ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে রচিত এবং ট্র্যাজেডি নাটক। এটিও রচিত হবার দীর্ঘ সাতবছর পরে ১৮৬৭ সালে শোভাবাজার নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়।[৪৩]

মধুসূদন নাট্যরচনায় 'শর্মিষ্ঠা' থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে প্রচলিত রীতি ভেঙ্গে এগিয়েছেন। 'শর্মিষ্ঠা'তে তিনি সংস্কৃত নাট্যরীতির মধ্যে বন্দী ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি 'কৃষ্ণকুমারী'র আখ্যান রচনায় এবং নাট্যগঠনে নিপুণতা দেখিয়েছেন। এই নাটকে সংস্কৃত রীতির প্রভাব কাটিয়ে তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকেই জয়যুক্ত করেছেন। সার্থক না হলেও ট্র্যাজেডি রচনার চেষ্টা হিসাবে 'কৃষ্ণকুমারী' অনেকখানি সফল। 'কৃষ্ণকুমারী' শুধু ট্র্যাজেডি নয়, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের সূত্রপাতও 'কৃষ্ণকুমারী'তে। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভাবগত আদর্শ এবং চরিত্র পরিকল্পনা দুইই পাশ্চাত্যপ্রভাবানুমোদিত।[৪৪] এইভাবে বাংলা নাটক সংস্কৃত প্রভাব কাটিয়ে পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে গ্রহণ করল। বাংলা নাটকেরও একটা পালা বদল হল।

যে বছরে মধুসুদনের দুটি প্রহসন ও 'পদ্মাবতী' প্রকাশিত হল এবং রামনারায়ণ 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' অনুবাদ করলেন, সেবছরই দীনবন্ধু লিখেছেন 'নীলদর্পণ'। 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী নাটক হিসেবে তার যে দুর্বলতাই থাকুক না কেন সেকালের সমাজ জীবনের সার্থক রূপায়ণ হিসেবে অনবদ্য। নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার এবং চাষীদের দুর্দশা যে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে দীনবন্ধু তুলে ধরেছেন তা যে কোন কালের নাট্যকারের পক্ষে শ্লাঘনীয়। বাংলা সাহিত্যে 'নীলদর্পণ' সেই অর্থে অমর। এ পর্যায়ে 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে বাংলা নাট্যরচনাবলীর তুলনা করলে বোঝা যায় তাঁর নাট্যরচনা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কতটা অভিনব ছিল। সেকালে ধনীর প্রাসাদমঞ্চে যে সব নাটকের অভিনয় হচ্ছিল তার মধ্যে ছিল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা 'বিদ্যাসুন্দরে'র বিলাসকলা। কিন্তু 'নীলদর্পণ' বাংলা নাটকে নিয়ে এল প্রতিবাদের ভাষা। আর এই প্রতিবাদী চরিত্রই

নাটক পেল অতি আধুনিক কালে। কিন্তু দীনবন্ধুর অন্য নাটকগুলিতে এই প্রতিবাদের তীব্রতা নেই, তার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে তীক্ষ্ণ সমাজ পর্যবেক্ষণ এবং নিপুণ রূপায়ণ। আসলে 'নীলদর্পণে'র মতো নাটক রচনা কেবল স্রষ্টার একার কৃতিত্বে হয়নি; সমাজই প্রকৃত নাট্যবস্তুর প্রতিবাদী চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁকে সহায়তা করেছে। নীলকরদের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে জেগে ওঠরে গল্প বাংলাদেশের সমাজে খুব বেশি তৈরি হয়নি। দীনবন্ধু তাঁর এই নাটকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যাকে নিয়ে এলেন। সেই কারণে স্রষ্টা এবং সমাজের যে আন্তর সম্বন্ধ তারই রূপায়ণ 'নীলদর্পণ'। 'নীলদর্পণে'র পরও এই সমাজ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা তাঁর নাট্যরচনায় রূপ পেয়েছে। কিন্তু এই যে 'নীলদর্পণ' বিষয়ের কথা সেকালের বাংলাদেশের মঞ্চে অভিনয় হতে পারেনি। ১৮৭২ সালে যখন জাতীয় মঞ্চ স্থাপিত হলো — তখনই এই নাটক সম্মানিত হল, জাতীয় নাট্যশালার উদ্বোধন এই নাটক নিয়ে। তারপর ন্যাশনাল থিয়েটারে কেবল দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় হলো কিছুকাল ধরে। এই কারণে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাট্যরচনার আদিপুরুষ বলে গিরিশচন্দ্র তাঁকে রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। দীনবন্ধুর নাটকে দুটো বিষয় স্পষ্ট হল। প্রথমত তাঁর নাটকে প্রতিবাদের ভাষা উঠে এল। আর এই প্রথম সে প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্তি জীবন, সমাজ সম্পর্ক এবং অর্থনীতি সব কিছুতেই অবলম্বন করে প্রকাশ পেল। প্রতিবাদের নাটক রামনারায়ণ বা উমেশচন্দ্র মিত্র উভয়েই লিখেছেন। রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্বে' কৌলীন্য প্রথার সমালোচনা, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকে সুলোচনার মৃত্যু, মন্মথের পাগলাগারদে বন্দী থাকা - দুইই সামাজিক ভাবে বিধবাবিবাহ অস্বীকার করবার প্রতিবাদ। কিন্তু দীনবন্ধু নাটক লিখে যে অর্থনীতি রাজনীতির সমালোচনা করলেন - তা কিন্তু বহু বাংলা নাটকে পাই না। 'নীলদর্পণ' নাটককে বিনোদনের স্তর থেকে মুক্ত করে তিনি প্রতিবাদের ভাষায় রূপান্তরিত করলেন। 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে মামলা হল। শাসক শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করল এই নাটক। এই গ্রন্থের গুরুত্ব যে এত বেশী বেড়ে গেল, তার কারণ কোনো কল্পিত প্রেমকাহিনী অবলম্বন করে তিনি নাটক লিখলেন না। বরং মানুষের অবস্থাকে তিনি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে দেখালেন। সেই অর্থে দীবন্ধুর নাটকগুলি "Social Criticism" শ্রেণীর। সাহিত্য হয়তো সমাজ সচেতনতা প্রকাশ করে, গভীর একটা সমালোচনাও করে। কিন্তু 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', 'বিয়েপাগলা বুড়ো' ইত্যাদি নাটকে দীনবন্ধু সেই কাজটাই খুব বড়ো করে দেখালেন। মধুসূদন দত্তের প্রহসন দুটিতে এই সমালোচনা ছিল। আর এই কাজটা করে তিনি যে সমাজ বীক্ষা প্রকাশ করলেন তাকে গ্রহণ করার মতো রুচি বা প্রস্তুতি কোনোটাই

বাংলা দর্শকের সেদিন ছিল না। দীনবন্ধুর নাটক তাই অভিনীত হতে দেরী হল। মধুসূদনের প্রহসন দুটিরও অভিনয় বিলম্বিত হয়েছিল। সেদিনকার প্রমোদমূলক নাটকের সঙ্গে এই শ্রেণীর নাটকের চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। সেজন্য 'নীলদর্পণ' দিয়ে সাধারণ নাট্যমঞ্চের মুক্তি হল। তাঁর নাটকই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বারবার অভিনীত হল এবং এইভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটলো।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন উপেক্ষিত হননি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাটক লিখেছেন। এই বাইশ বছরে তাঁর ১৩টি নাটক প্রকাশ হয়েছে। তাছাড়া তাঁর অনেকগুলি নাটক একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। সাধারণ রঙ্গ ালয়ে তাঁর অনেকগুলি নাটক অভিনীত হয়েছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন তখন বাংলায় মাত্র ৪টি নাটক ছিল। যে বছর তাঁর নাটক রচনার শেষ বছর অর্থাৎ ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় প্রায় আড়াইশোর বেশি নাটক রচিত হয়েছে। এই রচনাগুলির ভালোমন্দ বিচার না করেও শুধু সংখ্যার হিসাব দিয়ে বলা যায় বাঙালীর নাট্যাভিনয়ের ঝোঁক কতোটা বেড়েছে। রামনারায়ণ নাটক লেখা শুরু করেছিলেন একটি বাহ্যিক কারণে আর প্রথম নাটক লেখা হচ্ছে সমাজ ও শিল্পীর প্রতিভার সাযুজ্যে কিংবা নাট্যকারের আত্ম প্রবর্তনায়। কিন্তু এই কুড়ি বাইশ বছর বাংলা নাট্যরচনার প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে। মধুসূদন ও দীনবন্ধু বাংলা নাটকের রীতিনীতির যে পরিবর্তন সাধন করেছেন তা ক্রম ত্বরান্বিত হয়েছে। রামনারায়ণ ছিলেন পুরানো সংস্কৃত নাট্যরীতির লেখক। ক্রমশ তিনি নাটকের কিছু বহিরঙ্গ রূপান্তর সাধন করে বাংলা নাটকের প্রবহমানতার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নাট্যরচনার সংস্কৃত রীতি আর স্থায়ী ফল দিতে পারছিল না। যদিও মধুসূদনের নাটকেরও সংস্কৃত নাট্যরীতির ছায়া যথেষ্ট প্রগাঢ় ভাবেই পড়েছে , তবু 'কৃষ্ণকুমারী' থেকে তিনি পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করেছেন অনেক সতর্কভাবে। প্রকৃত য়ুরোপীয় ভঙ্গি এই নাটকে অনেকটা মধুসূদন আত্মসাৎ করেছিলেন; তার উপর এর রস ট্র্যাজিক।[৪৫] তাতে বাংলা নাটকের গতিপথও চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। দীনবন্ধু তাতে নাটকের প্রকৃতিকে দিয়েছেন নূতন রূপ। এই পথই পরবর্তী বাংলা নাটকের মূল ধারা রচনা করেছে। এই প্রেক্ষিতে রামনারায়ণের নাট্য বিচার করতে হবে।

নির্দেশিকা

১। শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, প্রথম নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮১, পৃঃ -১৩৮

২। শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮১, পৃঃ - ১৩৮

৩। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃঃ - ৯১

৪। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড , কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ - ৮৩

৫। শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৪০৫, পৃঃ - ৩৫

৬। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা - ৯, ১৩৮৬, পৃঃ - ৯১

৭। ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, বাংলা অনুবাদ নাটক সমীক্ষা, গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৪, পৃঃ - ১০

৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, তৃতীয় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬ , পৃঃ - ৫৭৮

৯। পুলিন দাস, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, (১৭৯৫ - ১৯২০), প্রথম খণ্ড, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা - ৭৩, ১৩৯০, পৃঃ - ১০

১০। ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, বর্ণালী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৯৯৭, পৃঃ - ৩৩৬

১১। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিকযুগ, তৃতীয় খণ্ড , চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৬, কলিকাতা - ৩১, পৃঃ ৫৮২ - ৫৮৩

১২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ - ১০১

১৩। সুকুমার সেন , বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, ১৩৮৬, পৃঃ - ৯৩

১৪। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা, ১৪০৫, পৃঃ - ১৫

১৫। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ১৯৭৫ পৃঃ - ১১০

১৬। ঐ পৃঃ - ১১০

১৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন কুলসর্বস্ব, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা-৩৪ ১৩৬৬, পৃঃ - ২

১৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৪০৫, পৃঃ- ১৮

১৯। পুলিন দাস, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, কলিকাতা, ১৩৯০, পৃঃ - ১১ - ১২

২০। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃঃ - ২০

২১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন কুলসর্বস্ব, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা-৩৪, ১৩৪৬, পৃঃ - ২

২২। পুলিন দাস, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, কলিকাতা, ১৩৯০, পৃ - ২০

২৩। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা ১৪০৫, পৃঃ - ২৫

২৪। পুলিন দাস, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, কলকাতা, ১৩৯০, পৃঃ - ৬০

২৫। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা ১৪০৫, পৃঃ - ৫৬

২৬। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৬ পৃঃ - ৯৫

২৭। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫ - ১৮৭৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা ১৪০৫, পৃঃ - ৪৯

২৮। পুলিন দাস, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, কলকাতা, ১৩৯০, পৃঃ - ৬০

২৯। ঐ পৃ -১২১

৩০। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, ১৩৮৬, পৃঃ- ৯৭

৩১। পুলিন দাস, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক (১৭৯৫ - ১৯২০) প্রথম খণ্ড, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১৩৯০, পৃঃ - ২৫

৩২। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলকাতা - ১৯৭৫, পৃঃ - ১২৯

৩৩। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, - ৯, ১৩৮৬, পৃঃ - ১১০

৩৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ , এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫ পৃঃ - ১৩৪ - ১৩৫

৩৫। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫ - ১৮৭৬), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা, ১৪০৫, পৃঃ - ৪৪, ৪৬

৩৬। পুলিন দাস, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক (১৭৯৫ - ১৯২০) প্রথম খণ্ড, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৩৯০, পৃঃ - ৫৯ - ৬০

৩৭। ক্ষেত্রগুপ্ত, নাট্যকার মধুসূদন, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা - ৯, ১৩৭৭, পৃঃ - ৩০

৩৮। ক্ষেত্রগুপ্ত, নাট্যকার মধুসূদন, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা - ৯, ১৩৭৭, পৃঃ - ৩১

৩৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ - ২১৮

৪০। ঐ পৃঃ - ২২০

৪১। ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদিত) মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ্, কলকাতা - ৯, ১৯৭৪, পৃঃ - ৫৪

৪২। ঐ পৃঃ - ৫৭

৪৩। ঐ পৃঃ - ৫৭

৪৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ - ২৪২

৪৫। ক্ষেত্রগুপ্ত, নাট্যকার মধুসূদন, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা - ৯, ১৩৭৭, পৃঃ - ১৮